মহাত্মা গান্ধী ও স্বাধীনতা আন্দোলন : একটি অন্য বিশ্লেষণ

সুপ্রিয় মুন্সী

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকা ঐতিহাসিক এবং সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের স্বার্থে সংগ্রাম থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ, নেতৃত্ব ও পরিচালনা, ইতিহাসের পাতায় নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে। এখানে পূর্বাঞ্চলীয় গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়ের সম্পাদক অধ্যাপক সুপ্রিয় মুন্সী, যিনি বিভিন্ন সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রভৃতি উচ্চশিক্ষার সঙ্গে জড়িত, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেছেন ও সমাজ সেবার জন্য রোটারি আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকার বিষয়টি একটি নতুন বা অন্য আঙ্গিকে দেখার চেষ্টা করেছেন। গান্ধীজী স্বাধীনতা আন্দোলনে ব্রতী হলেন কেন তা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তিনি তুলে ধরেছেন।

মহাত্মা গান্ধী ছিলেন এক অভিনব ব্যক্তিত্ব এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীও ছিল অনন্য। স্বাধীনতার অর্থও তাঁর কাছে সঙ্কুচিত ছিল না, ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। তিনি চেয়েছিলেন সমগ্র মানবজাতিকে সবরকম দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে এবং এই বিষয়ে তাঁর জন্মভূমি বা মাতৃভূমি ছিল ভারতবর্ষ তাঁর পরীক্ষাগার। এছাড়াও যে সত্য ও স্বরাজ ব্যবস্থাকে আদর্শ করে তিনি সারাজীবন প্রভূত ত্যাগ স্বীকার করে এক অভূতপূর্ব কর্মসাধানায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন, তার মূল বৈশিষ্ট্যই ছিল যতখানি সম্ভব ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সেই তুলনায় যথেষ্ট কম রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ। অবশ্য ব্যক্তি মানুষের সংস্কৃতি "তেন তক্ত্যেন ভূঞ্জিতাঃ, মা গৃধ কস্যচিৎধনম্" আদর্শেই গঠিত হবার আকাঙ্খায় ও বেড়ে ওঠার শর্তে আবদ্ধ ছিল। বস্তুতঃ মহাত্মা গান্ধীর স্বাধীনতা আন্দোলন ছিল গভীর তাৎপর্যপূর্ণ, কেবল বিদেশী বিতাড়ন বা বিদেশী শাসনের অবসান নয়। একবার তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে অভিযোগ করেছিলেন যে সুভাষচন্দ্র কেবল ব্রিটিশ দ্রব্য বর্জনের কথা বলেন। অর্থাৎ গান্ধীজীর বিদেশী দ্রব্য বর্জনের মাত্রা অনেক বেশী ও গভীর, তা স্ব-উদ্যোগ ও স্ব-নির্ভরতার প্রতীক, তা রাজস্ব বন্ধের প্রতীক।

যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষন করলে দেখা যেতে পারে যে পূর্ব ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ছিল বিদ্রোহের রূপে, গান্ধীজীর নেতৃত্বে যা পরবর্তী পর্যায়ে, অর্থাৎ ১৯২০-২১ সাল থেকে, বিপ্লবের রূপ নেয়। অর্থাৎ পূর্বের প্রচেষ্টা ছিল এক - মাত্রিক। মূলত বিদেশী শাসকের অপসারণ - স্থায়ী দেশ গঠনের প্রচেষ্টা বা দেশের মানুষকে এক নতুন সমাজের জন্যে তৈরী করে নেবার পূর্ণ প্রচেষ্টা নেই ; আন্দোলনও ছিল এলিটিস্ট্ বা সচেতন কিছু মানুষের, তিনি ক্ষুদিরাম বসুই হন বা মহামতি গোখলেই হন, মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং স্পোরাডিফ্ বা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে, সারা দেশে একই সঙ্গে বা সুসংবদ্ধভাবে নয়। ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গান্ধী আন্দোলনের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করে লিখেছিলেন - (১) "আমি ভায়ের সাগর পাড়ি দেব গো আমার ভয়-ভাঙা এই নায়ে", অর্থাৎ সাহস-অবলম্বন (২) "এতকাল আমাদের নিঃসাহসের ওপর ভর করে বিদেশী বনিক আমাদের ওপর রাজত্ব করেছে। এই এলেন মহাত্মাজী, আমাদের এই ভয় থেকে মুক্ত করলেন -" অর্থাৎ ভয় শূন্যতা, "আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে....." ইত্যাদি। অর্থাৎ বিদেশী শাসককে অস্বীকার করার মানসিকতা অর্জন করার মধ্যে যতখানি তাৎপর্য এবং শাসন ও শোষণের মানসিকতাকে বর্জন করে, বিদেশী শাসকের ভারতীয় জনগণের মধ্যে একাত্ম হওয়াকে বাস্তবায়িত করা তাই মূর্ত হয়ে উঠেছিল ১৯২১ সালে "এক বছরের মধ্যে স্বরাজ" গান্ধী ঘোষণায় - যা' তরুণ সুভাষচন্দ্রের কাছে তখনই অর্থবহ হয়ে ওঠেনি।

বিচারের ধারায় কোন আন্দোলনের তাৎপর্য তাৎক্ষনিকভাবে পূর্ণরূপে দৃষ্টিগোচর হয় না, তার জন্য সময়ের প্রয়োজন হয়। আজ বিচার-বিশ্লেষণ করতে বসে লক্ষিত হয় যে মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত স্বাধীনতা আন্দোলন ছিল বহুমাত্রিক। সম্ভবতঃ আদর্শ দেশ গঠনের ক্ষেত্রে, তার প্রয়োজনে জাতির সঠিকভাবে গড়ে ওঠার বিষয়ে ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন অন্তরায় হয়েছিল বলেই, 'জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের' পরে গান্ধীজী আর ফিরে তাকান নি। তার পূর্বে তিনি ছিলেন কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত, বিদেশী শাসন মূলতঃ শোষণ ও জাতির মর্যাদাহীনতার প্রতীক এরকম দৃষ্টিভঙ্গী পূর্ণভাবে লক্ষিত হয়নি।

গান্ধীজী কৃত স্বাধীনতা আন্দোলনের আর এক বৈশিষ্ট্য দেশ ও সমাজ পুনর্গঠনের প্রক্রিয়া একই সঙ্গে পরিচালনা করা, আরও একটি আন্দোলনকে সুসংগঠিত করা 'গঠনমূলক কার্যক্রম' এর মাধ্যমে। এটি সত্যিই অনন্য ও অভূতপূর্ব, ইতিহাসে কখনও, কোথাও এমন ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়নি। সমাজ-উন্নয়নের পদ্ধতির নিরিখেও এটি অনন্য। গান্ধীজীকে এই জন্যে আমি পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র 'সম্পূর্ণ বিপ্লবী' বলে মনে করি - যিনি কেবল ভাঙ্গা নয়, গড়ার কাজও একই সঙ্গে করেছেন। এছাড়াও তাঁর আরও একটি অভিনবত্ব 'একাদশ ব্রত' - এর মাধ্যমে উপযুক্ত মানুষ গড়ে নেওয়া যাতে সঠিক সমাজ, সত্য ও স্বরাজ সমাজ লাভ করা যায়। চিরকাল আমরা তত্ত্ব ও কাঠামো পরিবর্তনের কথাই বলেছি, মানুষের পরিবর্তনের কথা ভাবিনি। ফলে নতুন বাদের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা যে তিমিরে থাকার সেই তিমিরেই থেকে গেছি। এই আন্দোলনের আর একটি বৈশিষ্ট্য 'জন-জাগরণ' - যা গান্ধী-আন্দোলনের অন্যতম ও অবশ্য প্রয়োজনীয় শর্ত, এমনকি হাতিয়ারও। মাস্‌বেস্‌ বা জনগণভিত্তির ওপরেই সত্যাগ্রহের স্বার্থকতা নির্ভর করে ; ব্যক্তির ক্ষেত্রে কেবল গান্ধীজীর মত ব্যক্তিত্বই হয়ত এককভাবে সত্যাগ্রহকে সফল করতে পারেন। প্রখ্যাত 'ব্যঙ্গ' চিত্র শিল্পী 'লো'র এক বিখ্যাত ব্যঙ্গচিত্র হোল দন্ডমুন্ডের কর্তা দৈত্যাকৃতি লর্ড আরউইন্‌ দাঁড়িয়ে আছেন আর তাঁর সামনে ক্ষুদ্রাকৃতি গান্ধীজী হাঁটুমুড়ে বসে আছেন। কিন্তু লর্ড আরউইনের পেছনে হাজার হাজার একই আকৃতির গান্ধী বসে আছেন - অর্থাৎ এক গান্ধী অনেক গান্ধীতে বিস্তারিত হয়েছেন। কতজনকে আপনি জয় করবেন, বিশেষ করে প্রকৃত 'সত্যাগ্রহী' যাঁরা ! এই যে আদর্শে, সঠিক মানসিকতায় বিস্তারিত হওয়া, যা সত্যিই গান্ধী আন্দোলনের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই, তাই গান্ধীজী পরিচালিত স্বাধীনতা আন্দোলনের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরা লেখাপড়া জানতেন কিনা জানিনা। জানি ও স্বীকার করি তিনি আদর্শ মানুষী। এটি হারিয়ে ফেললাম বলেই আজ এক অবক্ষয়ের সম্মুখীন আমরা - বৈভব হয়ত বেড়েছে - চিত্ত ঠিক তেমনিইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

স্বাধীনতার আর এক স্থপতি পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু স্বাধীনতা আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর ভুমিকা সম্বন্ধে ভারী সুন্দরভাবে লিখেছেন - "দেশব্যাপী কর্মের দ্বারা তিনি লক্ষ লক্ষ মানুষকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তনে প্রয়াসী হলেন এবং নীতিভ্রষ্ট, ভীরু, হতাশা গ্রস্ত জাতিকে, যারা নানাভাবে শোষিত ও দাবিত হচ্ছিল, একসঙ্গে কাজ করতে ভুলে গিয়েছিল এবং মহৎ কাজের জন্যে ত্যাগ স্বীকারের মানসিকতা হারিয়ে ফেলেছিল, তাদের তিনি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যাবতীয় বিষয়ে চিন্তা করতে ও আগ্রহী হতে শেখালেন। প্রতিটি গ্রাম ও বাজার নতুন নতুন ভাবনা ও আদর্শের দ্বারা পল্লবিত হোল এবং মানুষের মনে নতুন আশা সঞ্চারিত হোল। এটি একটি আশ্চর্যজনক মানসিক পরিবর্তন - গান্ধীজী ভারতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈপ্লবিক ভূমিকা পালন করলেন।"